প্রকৃতি প্রয়োজনের যোগানদার লোভের নয়

সুব্রত সিনহা

পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষ স্ফুরণের শুভক্ষণের পর যুগযুগান্ত ধরে অকল্পনীয় প্রাণী এবং উদ্ভিদবৈচিত্র বিকশিত হয়। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিবর্তনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ তার বিশেষ গুণ ও বুদ্ধির জোরে সর্বশ্রেষ্টর সম্মান লাভ করেছিল। এই ক্রমবিকাশের ধারায় সে-ই প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত উপযোগ করত, যাতে কিছুটা ভবিষ্যৎ পেরেছে। এটাই যোগ্যতমের অস্তিত্ব বজায় রাখার (survival of the Fittest) একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস 'ডায়েলেকটিক্স্ অব নেচার' -য়ে তো সুস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য করেছেন যে আমরা প্রকৃতির অঙ্গ- বিদেশি বিজেতা নই; রক্তমাংস আর বুদ্ধি দিয়ে আমরা প্রকৃতির অধিকারভূক্ত এবং তারই এক অংশবিশেষ। প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের ব্যাপারে অন্য সব প্রাণীর চেয়ে আমাদের কিছুটা বেশি সুবিধা যে আমরা প্রকৃতির নিয়মকানুন শিখে সেগুলোকে সঠিকভাবে আমাদের অনুকূলে কাজে লাগাতে পারি। ('We by no means rule over nature like a conqueror over a foreign people, like someone standing outside nature- but that we, with flesh, blood and brain , belong to nature, and exist in its midst, and that all over mastery of it consist in the fact that we have the advantage over all other creatures of being able to learn its laws and apply them corectly..." The Part by Labour in the Trasformation form Ape to man : German translation.)

প্রথম যুগে বনজঙ্গলে ফলমূল কুড়নো আর পশুপাখি শিকার করাই মানুষের জীবনধারণের একমাত্র পন্থা ছিল। শিকার কিংবা আহরণ ছাড়া তারা গুহাতে বসবাস করতে আরম্ভ করে ('Hunter-gatherer' & 'Cave man')। তখন কাপড়চোপড়ের বদলে জন্তুজানোয়ারের ছাল তারা ব্যবহার করত। প্রকৃতিই যেন ছিল তার 'রোটি-কাপড়া-মকান'-এর যোগানদার। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে তারা ক্রমেই ছোট ছোট দলে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে আরম্ভ করে। বহু সহস্রাব্দ কাটাবার পরে, ভৌগোলিক অবস্থার ভিত্তিতে গন্ডি টেনে স্বাধীন গোষ্ঠী তৈরি হতে থাকে। জল-বায়ু পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র বাড়তে তাকে। তখন থেকেই নিজেদের মধ্যে হানাহানি বা বিবাদ বিসংবাদের সূত্রপাত। সামাজিক নেতৃত্বের জন্য ও রাজ্যক্ষমতা দখলের লোভে শুভ ও অশুভ দুই ধরনের সমস্যাই দানা বাঁধতে থাকে। তবে মানতে হবে যে সেই অবস্থাতেও প্রকৃতির প্রতি তাদের পুরো আনুগত্য এবং নির্ভরশীলতা ছিল। বেঁচে থাকার জন্য সে-ই সম্পদের সীমিত ব্যবহার করত— গন্ডি লঙ্ঘন না করে। এমনকী প্রকৃতি - পুজোর রীতিনীতিও অনেক আদিম সমাজেই ছিল যা এখনও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত।

আরও অনেক যুগ - যুগান্ত পার হওয়ার পরে। দক্ষিণ আমেরিকার মায়, মধ্যপ্রাচ্যের মিশর, ইউরোপের গ্রিক-রোমান এবং আমাদের উপমহাদেশের মহেঞ্জেদড়ো-হরপ্পা-কাহিবাঙ্গানে সভ্যতার বিকাশ হয়। পুরাতাত্বিকেরা ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্যসাবুদ পেয়েছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রকৃতিই সেই সভ্যতাগুলোকে কোল পেতে লালনপালন করত— যাকে বলা হয় cradels of civilisation। প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেষ্ট কাজে লাগানো সত্ত্বেও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার না করায় সমস্যা হত না।

অনমনীয় অহমিকা এবং সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার ফলে আজ মানুষের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বই সংকটাপন্ন। জনমুখী বিজ্ঞাপন এবং প্রকৃতি-সংগত প্রযুক্তি অবহেলায় পরিত্যাগ করে যে রাস্তায় সে এগোচ্ছে তা থেকে ফেরার পথের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকেই প্রকৃতির ওপর আঘাত মাত্রা ছাড়াতে শুরু করে। লাগামছাড়া প্রকৃতি নিধন বিংশ শতাব্দীতে বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। এর জন্য দায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতজনিত সশস্ত্র হানাহানি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতনের ঘটনা তো আছেই। যাও-বাকি ছিল, বিগত সহস্রাব্দের শেষ দুই দশকে মার্কিন সরকারের হাঁকডাক, বিশ্বায়নের রামধাক্কায় ভোগ্যপণ্য বিপণনের বহুজাতীয় উদ্যোগ-মেলা বসে যায়। এর ফলে প্রকৃতির ঘরে আজ ঠিক ডাকাত পড়ার অবস্থা! এরকম বল্গাহীন অবিমৃশ্যকারিতা মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিল। তখন থেকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বেআক্কেলে ব্যবহারে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এমনকী ভূমি, মৃত্তিকা এবং জলের মতো পুনর্নবীকরণীয় সম্পদ আজ প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো তথাকথিত 'উন্নত' রাষ্ট্র এবং তাদের শাকরেদ—শক্তিশালী বহুজাতিক সংস্থার কর্মকর্তারা। জি-৮ দেশের এই অশুভ আঁতাতের সভ্যরা ঠিক যেন গ্রহান্তরের প্রাণী— পৃথিবীর সম্পদকে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তার মতো শোষণ করে উজাড় করে দেওয়াই তাদের লক্ষ।

গভীর এই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় বোঝা দরকার। প্রকৃতির প্রতিমানুষের বর্তমান সংঘাতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সমানুভূতির (empathy) পথে ফিরতে হলে, যেমনটি প্রাক্-শিল্পায়ন যুগে ছিল। এখন মনে হয় যে বৃথাই প্লেটো, এঙ্গেলস্, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর মতো মনীষীরা মানুষের চলার পথনির্দেশিকা রেখে গিয়েছেন। এই বছরে মার্কিন সামাজিক পরিবেশবিদ ও প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি আল গোরে তো এক ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : অবস্থা যেরকম হয়ে উঠেছে, তাতে কয়েক দশকের মধ্যে মানুষ বিলীন হয়ে যাবে, তাকে ছাড়াই পৃথিবীর প্রাণীজগৎ চলতে থাকবে।

বিশেষত গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। যেহেতু মূল্যোবোধের মাপকাঠিতে 'আমি আছি' -র মর্যাদা 'আমার আছে'-র তুলনায় অনেক বেশি (Being is more important than haveing), শেষ পর্যন্ত এরাই প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। অবাক কাণ্ড যে দারিদ্র সত্ত্বেও তাদের জীবনে প্রচুর সুখ-শান্তি রয়েছে। এরা 'লোভে পাপ-পাপে মৃত্যু'-র শিকার নয়। বরঞ্চ শহরের সমৃদ্ধ ও উচ্চমধ্যবিত্ত বাসিন্দার জীবনেই সুখ-শান্তি বিপরীত মেরুতে থাকে। ছয় রিপুর প্রভাবে বিষময় এদের জীবন।

২০০৪ -এর ডিসেম্বর মাসে ভয়ংকর এক প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সারা বিশ্বকে আলোড়িত করে। সুমাত্রার কাছে সমুদ্রের নীচে একটি অতি শক্তিশালী (রিখটার স্কেলে নয়ের ওপরে) ভূমিকম্পন ঘটে। এর ফলে বিশাল আকারের সামুদ্রিক তরঙ্গ উৎপন্ন হয় যার নাম সুনামি। সমুদ্রকূলে আছড়ে পড়ে প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় হানল ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ, শ্রীলঙ্কা, আমাদের দেশের পূর্বোপকূলের কিছু অংশ এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। বহু হাজার লোক এবং অগুন্তি গবাদি পশুর প্রাণনাশ ছাড়া হাজার হাজার কোটি ডলারের উপকূলবর্তী সম্পত্তি বিনষ্ট হল। এর বছর দশেক আগে থেকেই অনেক অঞ্চলে ভূকম্প, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির সক্রিয় উদ্গীরণ, বিধ্বংসী প্লাবন এবং প্রবল বাত্যা (হারিকেন) ঘটতে থাকে। দু'হাজার চারের ঘটনাবলি ঠিক যেন ভূত্বকের কাঠামোগত প্রবল উত্তানপর্বের চরম পরিণতির মুহূর্ত!

দু'হাজার পাঁচেও সারা বছর ধরেই বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং খামখেয়ালি খরা-বৃষ্টি দেখা দেয়। ইউরোপ জুড়ে এবং মার্কিন মুলুকের নিউ অর্লিয়েন্সও হারিকেন কাটরিনার প্রকোপ এড়াতে পারে না। এসব প্রকৃতির প্রলয় দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে দেয় যে প্রকৃতির দুর্দমতার সামনে মানুষের সমস্ত প্রয়োগকুশলতাই নিষ্ফল। ঠিক যেন সারভানতেসের কাল্পনিক চরিত্র ডন কিহোতের বায়ুচালিত বিশাল হাওয়াকলের সঙ্গে বল্লম দিয়ে বন্ধ। এটা প্রকৃতির প্রতিশোধের এক ভয়ানক দৃষ্টান্ত। আফশোস এটাই যে গত দু'বছরে মানুষের অনেক কীর্তিকলাপ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পরাক্রমে উন্মত মানুষের বোধোদয়ের এক ফোঁটা লক্ষণও দেখা দেয়নি।

প্রকৃতির অধিকার লঙ্ঘনের কুকীর্তির উল্লেখযোগ্য ফিরিস্তি হল—

১। ঘনিভূত অক্সিজেনের আস্তরণ হ্রাস। (Ozon layer depletoon)

২। ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি। (Global warming)

৩। উদ্ভিত এবং প্রাণীর বৈচিত্রের বিনাশ। (biodiversity decimation)

৪। পরস্পরের ওপরে নির্ভরশীল জীবসমূহের খাদ্যশৃঙ্খল দুষিত (Corruption of Food Chain)

৫। জীবনপ্রবাহের জন্য অত্যাবশ্যক প্রাকৃতিক চক্রগুলি বিঘ্নিত। (disruption fo life sustaining natural cycle)

৬। জীবনরক্ষাকারী জল, বায়ু ও ভূমির সুসম্বন্ধ ব্যবস্থাতে বিষপ্রয়োগ এবং অবনমন। (toxification / degradation of life support system of air, water and land)

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে দু'হাজার এক সালে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট উনিশটি সংস্থার যৌথ প্রয়াসে একটি চুতর্বর্ষব্যাপী Millenium Ecosystem Asscssment -এর কর্মসূচী নেওয়া হল। এটার উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশের সঙ্গে সংহতি রক্ষা, মানুষের প্রয়োজন এবং পরিচালনের বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করা। গত বছরে প্রকাশিত প্রথম রিপোর্ট (Living Beyond our means) অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ —স্থানীয় জনগোষ্ঠীর হাতে মালিকানা ন্যস্ত করলেই সম্ভব হতে পারে। তাদের হাতেই দিতে হবে ওই সম্পদ থেকে উদ্ভূত ফয়দা ভোগ এবং সেগুলির সংরক্ষণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।

এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমগ্র মানুবসমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। বিশ্বায়নের পরে জি-৮ গোষ্ঠীর দেশগুলো কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সম্পদসমৃদ্ধ (অথচ অনুন্নত) দেশগলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রারিক্ত শোষণ ও বিনাশকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। তাই অবস্থা বদলানো খুবই দুষ্কর।

বিলীন হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এড়াতে কয়েকটি কর্মসূচি রূপায়ণ করা দরকার। গ্লোবাল ওয়ামিং এবং ওজনস্তর হ্রাসের সমস্য সামলাতে রাষ্ট্রসংঘ এবং আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা এখনও পর্যন্ত বিফল—প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, বিশেষত গাড়ি, এরোপ্লেন এবং আরও অনেক রকমের মনুষ্যকেন্দ্রিক গ্যাস উদ্গীরণ কমাবার জন্য। তবে বলা যায় যে একটা সচেতনতা এসেছে। ওই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে না ঢুকে, আমাদের দেশের পরিবেশ এবং কৃষি-সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা করব। কৃষিক্ষেত্র বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বর্তমানে এই ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ প্রকৃতি-বিরোধী। ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে তো বটেই। সেজন্য কৃষিপদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তবেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। যেমন—

ক। চাষবাসের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের মতো দ্রব্যের বদলে জৈব সার ও কীটনাশকারী উদ্ভিদের ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে হবে। দোআঁশলা (হাইব্রিড) এবং বিদেশাগত (exotic) ফসল (যেমন বোরো ধান, গম ইত্যাদি) তুলতে প্রচুর প্রমাণে সেচের জল ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন। এইসব রাসায়নিক দ্রব্য

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জল-মাটিকে বিষাক্ত করে এবং উর্বরতাও কমিয়ে দেয়। এ-ধরনের চাষের পথ ছাড়তে হবে।

খ। সারা বছরের বাংরবার একরকম ফসল (যেমন ধান বা গম) না তুলে পালা করে বিভিন্ন ধরনের ফসল তোলা উচিত।

গ। ধন্ধে, মুসুরি ডাল বা অন্য শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ লাগালেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় না। আবার, একই জমিতে একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করা উচিত।

ঘ। ভারত এক বিশাল ভূমিবৈচিত্রের দেশ। প্রায় প্রত্যেকটি জমির টুকরোর সেচযোগ্যতা ও অন্তর্নিহিত গুণেও অনেক তফাত। তাই প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখতে চাষবাস একেবারে স্থানীয় স্তরে (local, micro-lavel) নিয়ে যেতে হবে। একমাত্র ক্ষুদ্র জলবিভাজিকাভিত্তিক (watershed based) স্তরেই এটা সম্ভব। তাতে সব জমির গুণানুযায়ী ঘাস, গাছপালা বা শস্য লাগিয়ে ভূমিক্ষয় কমানো যায় আর বন্যার প্রকোপও কমে।

ঙ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যৌথ প্রথায় চাষের যোগান ও প্রয়োজনমতো সেচব্যবস্তা (collectivisation of inputs & water, group farming) করলেও কৃষিসংস্কার অনেক এগোবে। রাজেন্দ্র সিং-খ্যাত আলোয়ারের জোহাড় হচ্ছে সাফল্যের নিদর্শন। আশার কথা যে বহু জায়গায় এই প্রথায় চাষবাস চলছে।

আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ একাকাতে জীবনরক্ষাকারী জল, মাটি এবং বায়ু দূষিত বা বেহাল দশায়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী শতকরা সত্তর ভাগ কৃষিযোগ্য জমি উর্বরতা খোয়াতে বসেছে। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি কৃষিবিদ এবং সেচ ইঞ্জিনিয়াদের হাতে কৃষি ও জলবন্টন ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া হয়। এসব সরকারি বিশারদেরা স্থানীয় জলমাটির সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের ওপর জ্ঞান চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এরা অত্যন্ত পটু। তার ওপরে রাসায়নিক চাষবাসের জন্য দেওয়া ভরতুকির লোভ দেখিয়ে কুকার্য সমাপন করা যাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থার দালালেরা এই ব্যাপারে তাদের সুগ্রীব দোসর।

এর বদলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বহু প্রজন্ম ধরে অর্জিত কৃষিজ্ঞান ও কর্মপটুত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়িত্ব রক্ষা করা যাবে। কিন্তু গ্রামের লোকদের এই ব্যাপারে দ্বিধাহীন ও সুংসংবদ্ধ আত্মপ্রকাশে (confidence and articulation) ভূমি -সাক্ষরাত (lind literacy) প্রথাকে ব্যবহার করতে হবে। এই ব্যাপারে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ সাহায্য করবে। এটা করলেই প্রকৃতিধর্মী লোকজ্ঞানের মাধ্যমে স্থানীয় গ্রামের মানুষেরা আসল উন্নয়নের ভাগীদার হতে পারবে। এটাই রাষ্ট্রসংঘের Living beyond Our means রিপোর্টের মূল বক্তব্য। ভারত সরকারের ওপরে সুসংবদ্ধ সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। রাসায়নিক কৃষিকর্মের ভরতুকি তুলে দিতে হবে। যে ক'বছর পন্থা পরিবর্তনে লাগে পরস্পরাগত, জৈবপ্রথায় চাষের জন্য ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনীতিবিদ এবং সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (কিন্তু শক্তিশালী) সম্পন্ন শ্রেণির ওপরে অবশ্যই চাপ দিতে হবে। বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি ছলে-বলে-কৌশলে সরকারি নীতি নির্ধারণ প্রথাকে প্রভাবিত করছে। এদের প্রভাব সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

স্বাধীনতার পর বহুবার দেশের গ্রামবাসীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রহস্যময়ভাবে রাজনৈতিক সুক্ষ্মদর্শিতা দেখিয়ে ক্ষতিকারক অবস্থা বদলে ফেলতে পেরেছেন। আমাদের দেশ বিশ্ব পরিমাপে বিপুল গ্রামীণ জনসংখ্যা ও যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই মানুষের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের বিষয়ে লোকবিজ্ঞান ভান্ডারের সাহায্যে তারা দিগদর্শক হতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য যা ধরে রাখা যায় সেটাই সুস্থায়ী এবং প্রকৃত 'উন্নয়ন'। মহাত্মা গান্ধীর অমুল্য বক্তব্যের সারাংশ এটাই ছিল যে প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে কিন্তু লোভের যোগান দিতে পারে না। এটাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জীবনযাপনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আবার চরক সংহিতার ভাষ্য, 'যে -না বোঝে তার কাছে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও মানুষকে ভালবাসা অবিচ্ছেদ।'

লেখক অবসরপ্রাপ্ত উপ-মহানির্দেশ, ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ।